ইসলামী খিলাফত সরকারের শিল্পায়নের মডেল

শিল্পায়ন বলতে কী বোঝায়?
আজকের মুসলিম বিশ্ব শিল্পোন্নত দেশগুলো থেকে অবশ্যই অনেকদূর পিছিয়ে। পশ্চিমা দেশগুলো এখন থেকে দেড়শ-দুইশ বছর আগেই শিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে। কিন্তু মুসলিম দেশগুলো এখনও প্রায় প্রাথমিক পর্যায়ে রয়ে গেছে এবং অনেকাংশেই উন্নত দেশগুলোর উপর নির্ভরশীল থেকে গেছে। শুরুতে শিল্পায়ন তথা শিল্পোন্নত অর্থনীতি বলতে কি বোঝায় তা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। বাস্তবে যখন কোন অর্থনীতি ম্যানুফ্যাকচারিংকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এবং ম্যানুফ্যাকচারিংই অর্থনীতির অন্য সেক্টরগুলোর চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে তখন সেই অর্থনীতিকে আমরা শিল্পোন্নত অর্থনীতি হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি। আর ম্যানুফ্যাকচারিং বলতে কাঁচামালকে প্রক্রিয়াজাতকরণ করে ব্যবহার্য পণ্যে পরিণত করা বোঝায়। উদাহরণস্বরূপ আমরা বৃটিশ সাম্রাজ্যের কথা বলতে পারি। ম্যানুফ্যাকচারিং ছিল তার অর্থনীতির মূল বিষয়। জাহাজ নির্মাণ, গোলাবারুদ উৎপাদন, খনিজ আহরণে তাদের দক্ষতা তাদেরকে পরাশক্তিতে পরিণত করেছিল। অর্থনীতির এই বৈশিষ্ট্যের কারণে তারা সহজেই যে কোন স্থানে যুদ্ধ সূচনা এবং উপনিবেশ স্থাপন করতে পারতো। শান্তিকালীন সময়ে এসব শিল্পকারখানা বেসামরিক কাজে ব্যবহৃত হতো।

একটি জাতি যখন বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনে দক্ষতা অর্জন করে এবং তার শিল্পভিত্তি মজবুত থাকে, তখনই সেই জাতি স্বনির্ভর হয় এবং অন্য জাতির নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়। কিন্তু শিল্পায়ন না ঘটলে একটি জাতিকে প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনীয় উপকরণ থেকে শুরু করে প্রতিরক্ষার মত অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতেও অন্য জাতির উপর নির্ভরশীল থাকতে হয়। আর এই অবাঞ্ছিত বাস্তবতাতেই আজকের মুসলিম বিশ্ব নিমজ্জিত।

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও শিল্প-কারখানার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি:
মুসলিম হিসেবে আমরা প্রতিটি বিষয় কুরআন ও সুন্নাহ্‌'র আলোকে দেখতে বাধ্য। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপারেও একই কথা। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে এ হাদীসটি বর্ণিত আছে যে, খেজুর গাছের কলম করা বিষয়ক কৃষি প্রযুক্তির ব্যাপারে তিনি (সাঃ) বলেছেন, **"তোমাদের দৈনন্দিন জীবনের এসব বিষয় তোমরাই ভাল জান।" [আহমদ]**

এটাও বর্ণিত আছে যে, তিনি (সাঃ) দু'জন সাহাবীকে যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ প্রযুক্তি শিখে আসার জন্য ইয়েমেন পাঠিয়েছিলেন।

এরই প্রেক্ষিতে, মুসলিম উম্মাহ সবসময়ই এ বিষয়ে সচেতন ছিল যে, দ্বীন বা জীবনব্যবস্থা সম্পর্কিত বিষয়াদির (যেমন: ইবাদত, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি) ক্ষেত্রে তারা সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ্‌ থেকে সমাধান নিতে বাধ্য। আর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে স্বীয় জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান ও গবেষণার মাধ্যমে আমাদের পারিপার্শ্বিক জগতের কার্যরীতি আবিষ্কার করার অনুমতি দিয়েছেন, এমনকি উৎসাহিত করেছেন। এ কারণেই মুসলিম উম্মাহর কাছে কখনোই ওহীলব্ধ জ্ঞানের সাথে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে সাংঘর্ষিক মনে হয়নি। উদাহরণস্বরূপ, দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রা.) এর শাসনকালে তথা ইসলামের প্রাথমিক যুগেই নৌপ্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশ ঘটানো হয়েছিল।

উপরন্তু, ইসলামী শাসনব্যবস্থা তথা খিলাফত যুগের বৈজ্ঞানিকরা কুরআনের বিভিন্ন আয়াত থেকেই মহাবিশ্ব সম্পর্কে গবেষণা করার ব্যাপারে উৎসাহ ও দিক নির্দেশনা পেতেন। যেমন, আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

"নিশ্চয়ই আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং দিন ও রাত্রির আবর্তনে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য নিদর্শন রয়েছে যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহ্‌'কে স্বরণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে এবং বলে, 'হে আমাদের প্রভূ! তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করোনি। গৌরব তোমার জন্যই! আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা কর'।" [সূরা আলি ইমরান : ১৯০-১৯১]

"এবং আমি সৃষ্টি করেছি লোহা, যাতে রয়েছে বিপুল শক্তি, এবং সেইসাথে মানবজাতির জন্য নানা উপকার।" [সূরা আল হাদীদ : ২৫]

ইসলামী শাসনকালে মুসলিম বিজ্ঞানীরা নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করে এর ভিত্তিতে 'আকাশ মানচিত্র' প্রস্তুত করেছিলেন যা সমুদ্রে নৌ চলাচলের কাজে লাগতো। ইবনে ইউনুস সময় পরিমাপের জন্য পেন্ডুলামের ব্যবহার দেখিয়েছিলেন। মুসলিম বিজ্ঞানীরাই প্রথম বীজগণিতকে গণিতের স্থায়ী শাখায় পরিণত করেন। এলজেবরা শব্দটির উৎপত্তিই হচ্ছে আরবী শব্দ 'জবর' থেকে। কাগজ, কম্পাস, গান পাউডার, অজৈব এসিড এবং ক্ষারীয় পদার্থ ইত্যাদি হচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিস্কৃত জিনিসগুলোর মধ্যে কয়েকটি মাত্র। এসব অবদান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পরবর্তীকালের অগ্রগতিতে অনবদ্য অবদান রেখেছিলো।

মুসলিম বিশ্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পশ্চাদপসরণতা শুরু হয় তখন থেকে যখন মুসলিমরা ইসলামকে বোঝার ক্ষেত্রে এবং এর বাস্তবায়নের ব্যাপারে অবহেলা শুরু করে। মুসলিম উম্মাহ্‌র অগ্রগতির জন্য আমাদেরকে প্রথমে ইসলাম বাস্তবায়নের মাধ্যমে পুনরায় উঠে দাঁড়াতে হবে যাতে করে আমরা একটি পূর্ণাঙ্গ সভ্যতার (ইবাদত, শাসনব্যবস্থা, অর্থনীতি ইত্যাদি) অধিকারী হতে পারি এবং এরপরই আমাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ ঘটবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অগ্রগতি মুলতঃ আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি, তার প্রেরিত রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি এবং শেষ বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাসের স্বাভাবিক ফলশ্রুতি। তাই ইসলাম বাস্তবায়ন ছাড়া এই উম্মাহ্‌র উদ্ভাবনী শক্তিকে পুনরায় জাগিয়ে তোলার আর কোন উপায় নেই।

নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে খিলাফতের শিল্প নীতি সাজানো হবে:

১. রাজনৈতিক আকাংখা
মুসলিম বিশ্ব শিল্পায়নের দিক থেকে পশ্চাৎপদ থাকার একটি মূল কারণ হচ্ছে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক আকাংখার অনুপস্থিতি। মুসলিম শাসকরা এতদিন আমাদের দেশগুলোকে শুধুমাত্র পশ্চিমা বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর বাজারে পরিণত করার নীতি বাস্তবায়ন করেছে। তথাকথিত মুক্তবাজার ও মুক্তবাণিজ্যের ধারণা সব সময়ই আমাদের দেশগুলোর শিল্প কারখানা ধ্বংসের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। শিল্প কারখানা বলতে যা অবশিষ্ট আছে সেগুলোকে ব্যবহার করা হয়েছে মূলতঃ পশ্চিমাদের ভোগের সামগ্রীর সরবরাহ কেন্দ্র হিসেবে।

খিলাফত যখন আবার প্রতিষ্ঠিত হবে তখন তার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে অভিন্ন রাজনৈতিক লক্ষ্য ও আকাংখার ভিত্তিতে সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে একতাবদ্ধ করা। যখন খিলাফত রাষ্ট্রের জনগণ একটি সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্যের ব্যাপারে একমত হবে তখন তারা সবাই সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করতে থাকবে। এক সময় মুসলিমদের বাকী ভূ-খন্ডগুলোও এ ব্যাপারে একমত হবে এবং তারাও খিলাফতের সাথে একাত্ম হওয়ার জন্য অগ্রসর হবে। বর্তমানে বিদ্যমান পরিকল্পনাহীনতা থেকে খিলাফত রাষ্ট্র উম্মাহকে বের করে আনবে এবং সুনির্দিষ্ট নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের সকল দক্ষ ও অভিজ্ঞ নাগরিককে একতাবদ্ধ করবে।

বৃহত্তর জনগণের আস্থা সৃষ্টির জন্য যা সবচেয়ে কার্যকর তা হলো যথাযথ সামরিক সক্ষমতা। নিজেদের নিরাপত্তা রক্ষা এবং শত্রুকে পরাজিত করার জন্য একটি বৃহৎ ও অত্যাধুনিক সামরিক বাহিনীর কোন বিকল্প নেই। এ ধরণের একটি সামরিক শক্তির আকাঙ্খা, যা এই মুহূর্তে মুসলিম বিশ্বে অনুপস্থিত, স্বাভাবিকভাবেই খিলাফতকে দ্রুত প্রযুক্তিগত উন্নয়নের দিকে ধাবিত করবে। আর এজন্য প্রয়োজন ব্যাপক শিল্পায়ন। আর শিল্পায়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে কারিগরি দক্ষতা আর কাঁচামালের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ। এ দু'টি পূর্বশর্ত কিভাবে পূরণ হবে সে জন্যও যথাযথ নীতি ও কৌশল থাকবে খিলাফত সরকারের।

২. প্রতিরক্ষা কেন্দ্রিক অর্থনীতি গড়ে তোলা
কোন অর্থনীতি যে সেক্টরে বেশি গুরুত্ব দেয় তার ভিত্তিতেই সে অর্থনীতির চরিত্র নির্ধারিত হয়। সেই সেক্টরটিই অন্যান্য সেক্টরের জন্য চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। খিলাফতের অর্থনীতি হবে প্রতিরক্ষাশিল্প কেন্দ্রিক অর্থনীতি। উন্নত প্রতিরক্ষা কাঠামো গড়ে তোলা ও তার ক্রমাগত প্রবৃদ্ধি ও আধুনিকায়নই হবে অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি। এ ধরণের অর্থনীতি যে শুধুমাত্র কর্মসংস্থান ও সম্পদ সৃষ্টি করবে তা নয় বরং বৈরী পরাশক্তিগুলোর আগ্রাসী পরিকল্পনা থেকেও খিলাফতকে রক্ষা করবে।

প্রতিরক্ষা কেন্দ্রিক অর্থনীতির অপরিহার্য করণীয় হলো সমরাস্ত্র তৈরীর কারখানার পাশাপাশি সহায়ক শিল্প (Support Industry) হিসেবে স্টীল, লোহা, কয়লা, যানবাহন নির্মাণ, খনিজ উত্তোলন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি শিল্প গড়ে তোলা।

রাষ্ট্রকে শিল্পোন্নত করতে হলে আরেকটি বিষয় প্রয়োজন আর তা হলো এমন একটি ফোরাম গড়ে তোলা যারা সুনির্দিষ্টভাবে শিল্পপতিদেরকে নিয়ে কাজ করবে এবং সব

সময় তাদেরকে উৎসাহ যোগাবে। ভারী শিল্পের প্রয়োজনে সাপোর্ট ইন্ডাষ্ট্রি গড়ে তোলার কাজটি অনেকাংশেই শিল্প উদ্যোক্তাদেরকে করতে হবে এবং এক্ষেত্রে তাদেরকে বিশেষ সুবিধা প্রদান করার সুনির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় নীতি থাকবে। দরকার হলে লোহা, কেমিক্যাল ইত্যাদি শিল্পের জন্য উদ্যোক্তাদেরকে বিনামূল্যে সরকারী জমি বরাদ্দ দিবে। খনিজ সম্পদ উত্তোলন ও অন্যান্য কেমিক্যাল নিষ্কাশনের জন্য যৌথ বিনিয়োগের নীতি গ্রহণ করা যেতে পারে; যেসব শিল্প রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তায় সরাসরি অংশগ্রহণ করছে তাদের ক্ষেত্রে কর রেয়াত ও ঋণ প্রদানসহ বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করা হবে।

খিলাফত ব্যক্তিমালিকানাধীন পুঁজিকে রাষ্ট্রের পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত করবে এবং প্রধান প্রধান শিল্পপতিদেরকে রাষ্ট্রের সমৃদ্ধির জন্য ঐক্যবদ্ধ করতে সচেষ্ট থাকবে। আমাদের এ কথা মনে রাখতে হবে যে এমনকি আজকের দুঃখজনক বাস্তবতায়ও মুসলিম বিশ্বে ধনাঢ্য শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীর কোন অভাব নেই। রাষ্ট্রের পরিকল্পনার মধ্যে বড় অর্থনৈতিক লাভের সম্ভাবনা দেখলে আমাদের বর্তমান সম্পদশালীরাও কৌশলগত শিল্পে বড় বিনিয়োগে অবশ্যই এগিয়ে আসবে। এছাড়া তাদেরকে পুঁজি বিনিয়োগে উৎসাহিত করার জন্য যদি লাভের পাশাপাশি দেশ ও জনগণের কল্যাণের বিষয়টিও বোঝানো যায় তাহলে তাদের উদ্যম নিঃসন্দেহে আরো বৃদ্ধি পাবে।

৩. খনিজ প্রক্রিয়াকরণ

নিজস্ব খনিজ ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য ও অন্য জাতির উপর নির্ভরশীলতা কমানোর লক্ষ্যে খিলাফত রাষ্ট্র তার খনিজদ্রব্য উত্তোলন, প্রক্রিয়াকরণ ও শোধনাগার তৈরি করবে। যেহেতু শিল্পের ক্ষেত্রে কাঁচামাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, তাই কাঁচামালকে ঘিরে আমাদের মূল উদ্দেশ্য থাকবে পরনির্ভরশীলতা কমানো। বিদেশী কারিগরি দক্ষতার উপর নির্ভরশীল না থাকাই হবে খিলাফতের অভ্যন্তরীণ সম্পদগুলোর উত্তোলন ও প্রক্রিয়াকরণের নীতি।

মুসলিমদের বেশিরভাগ সম্পদই প্রক্রিয়াকরণ করা হয় বিদেশী কোম্পানিগুলোকে দিয়ে তথা মার্কিন-বৃটিশ কোম্পানিগুলোকে দিয়ে। উত্তোলনের নামে এসব সম্পদের বেশিরভাগ অংশই এ সকল পশ্চিমা কোম্পানিগুলোকে দিয়ে দেয়া হয়। কখনও কখনও দেশীয় তেল কোম্পানিগুলোকেও বেসরকারীকরণের নামে বিক্রি করে দেয়া হয় ঐসব বিদেশী কোম্পানিগুলোর কাছে।

খনিজ প্রক্রিয়াকরণে স্বনির্ভরশীল হওয়ার জন্য বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন:

ক. যে সকল সম্পদ খিলাফতের মধ্যে থাকবে না সেগুলো অন্যান্য দেশ থেকে আমদানি করে আনা হবে যদিও আলাহ্'র রহমতে মুসলিম ভূ-খন্ডগুলো পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর।

খ. মুসলিম বিশ্বে বিদ্যমান পশ্চিমা কোম্পানিগুলোর ব্যাপারেও খিলাফতকে কিছু নীতি নির্ধারণ করতে হবে। তারা মুসলিম বিশ্বে থাকলে আমাদের কি সুবিধা, আর কি সমস্যা, তা গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। বর্তমানে তারা চরম স্বাধীনতা ভোগ করছে; বিশেষ করে খনিজ সম্পদের বিষয়টিতে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা শ্রম ও দক্ষতার মজুরি হিসেবে খনিজ সম্পদের অংশীদারিত্ব পেয়ে থাকে। এছাড়া মুসলিম বিশ্বের দূর্নীতিপরায়ন শাসকগোষ্ঠী ও অভিজাতশ্রেণী ব্যক্তিগত স্বার্থের বিনিময়ে জনগণের সম্পদ বিদেশীদের হাতে তুলে দিচ্ছে; যার কারণে খনিজ সম্পদের প্রকৃত অধিকারী হয়েও তা থেকে জনগণ তেমন কোন সুবিধা পাচ্ছে না।

গ. সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো এসব পশ্চিমা কোম্পানিগুলো কোন দক্ষতা বা প্রযুক্তি সংশিষ্ট জনগোষ্ঠীর কাছে হস্তান্তর করছে না। খিলাফতের অভ্যন্তরে কোন বিদেশী কোম্পানীকে কাজ করতে হলে অবশ্যই মুসলিমদের সাথে প্রযুক্তি হস্তান্তর চুক্তি করতে হবে। প্রযুক্তি বিনিময়ের ক্ষেত্রে পাকিস্তান সম্প্রতি একটি ভাল নজির স্থাপন করেছে। সম্প্রতি ফ্রান্স ও পাকিস্তানের মধ্যে সাবমেরিন নির্মাণ ও সরবরাহের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ চুক্তির বলে ফ্রান্সের কাছ থেকে পাকিস্তান ৩টি সাবমেরিন কিনবে, কিন্তু শর্ত হলো এর একটি নির্মিত হবে ফ্রান্সে আর বাকী দুটি ফ্রান্সের তত্ত্বাবধানে পাকিস্তানের প্রযুক্তিবিদদের হাতে তৈরী হবে। এ ধরণের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্বলিত নির্মাণ চুক্তি অবশ্যই উন্নত শিল্প বিকাশে সহায়ক হবে।

ঘ. খিলাফত রাষ্ট্র অবশ্যই তার নিজস্ব কারখানার উৎপাদন সক্ষমতা সম্পর্কে গতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি রাখবে। যে সব প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি আমাদের নেই তা দ্রুত বন্ধু রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে সংগ্রহ করে নিজেদের সক্ষমতাকে যুগোপযোগী করে রাখতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় পাকিস্তানে বর্তমানে চিনি ও সিমেন্ট নির্মাণের প্লান্ট, কৃষি যন্ত্রাংশ উৎপাদন কারখানা, সড়ক নির্মাণের জন্য রোলার তৈরীর কারখানা ইত্যাদি ক্ষুদ্র ও ভারী শিল্পের কারখানা আছে। এসব কারখানাকে সামান্য পরিবর্তন করেই সেখানে ভারী লৌহ ও ইস্পাতজাত সামগ্রী তৈরী করা সম্ভব। এসব লৌহ ও ইস্পাতজাত পণ্য আবার অন্যান্য শিল্প, যেমন গাড়ী নির্মাণ, সমরাস্ত্র নির্মাণ ইত্যাদিতে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

৪. খিলাফত তিনভাবে শিল্পে বিনিয়োগ করবে

সরাসরি বিনিয়োগ: যে সব শিল্প সাধারণত লাভজনক ভিত্তিতে চালানো সম্ভব নয়, কিন্তু রাষ্ট্রের অন্যান্য শিল্পের বিকাশ ও নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্য, সেগুলোকে অবশ্যই রাষ্ট্রের নিজস্ব বিনিয়োগে স্থাপন করতে ও চালু রাখতে হবে। যেমন মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র, সাবমেরিন ও যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণ, রেলওয়ে ইত্যাদি।

যৌথ বিনিয়োগ: যেসব ক্ষেত্রে পরবর্তীতে রাষ্ট্র তথা জনগণ লাভবান হবে, অথবা যেসব শিল্প সরকারের অংশগ্রহণ ছাড়া গড়ে উঠতে পারবে না, যেমন তেল উত্তোলন এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা ইত্যাদিতে রাষ্ট্র ব্যক্তিখাতের সাথে যৌথ বিনিয়োগ করবে।

ব্যক্তিখাতের শিল্পে ভর্তুকি বা সুবিধা প্রদান: যারা রাষ্ট্রের চাহিদা মতো পণ্য উৎপাদন করবে, যেমন কোন গাড়ি কারখানা যদি সামরিক যান বা ট্যাঙ্ক উৎপাদন করে তবে তাদেরকে যথাযথ আর্থিক সুবিধা দেয়া হবে। যারা অন্যান্য শিল্পের জন্য কাঁচামাল উৎপাদন করে তাদেরকে ভর্তুকি বা ঋণ সুবিধা দেয়া যেতে পারে। রাষ্ট্রের অর্থনীতি ও নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বৃহৎ ইন্ডাষ্ট্রি (যেমন অস্ত্র কারখানা ইত্যাদি) স্থাপনকারীদেরকে বিনামূল্যে সরকারী জমি বরাদ্দ দেয়া হবে।

আমরা যদি বিশাল আকারের প্রতিরক্ষা ইন্ডাষ্ট্রি গড়ে তোলার কাজে হাত দিই তাহলে ব্যক্তিখাত থেকে অবশ্যই বড় ধরণের বিনিয়োগ আসবে কারণ সরকারের তৈরী করা বড় ধরণের চাহিদা যে সুযোগ সৃষ্টি করবে তাকে কাজে লাগাবে প্রাইভেট সেক্টর। সবার আগে যে ভাল ফলটি দৃশ্যমান হবে তা হলো ব্যাপক কর্মসংস্থান।

কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেলে স্বাভাবিকভাবেই দৈনন্দিন পণ্যের ব্যবহার ও চাহিদা বাড়বে, কেননা অনেক মানুষের হাতে তখন খরচ করার মত টাকা আসবে। পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি পেলে অর্থনীতির অন্যান্য সেক্টরেও কাজ ও উৎপাদনশীলতা বাড়বে। নিত্য পণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির পাশাপাশি বিলাসী পণ্যের চাহিদা, ব্যবহার ও উৎপাদন বাড়বে, সেখানে আবার নতুন শিল্প গড়ে উঠার সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং সাধারণ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ আরো সম্প্রসারিত হবে; বাড়বে অর্থনীতিতে সম্পদের প্রবাহ।

৫. কৃষি

একটি টেকসই শিল্পায়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা। জাতি যাতে খাদ্যের জন্য বিদেশী শক্তির উপর নির্ভরশীল না থাকে এটা নিশ্চিত করা অতীব জরুরী। সকল উন্নয়নই অর্থহীন হয়ে পড়বে যদি জনগণের মৌলিক খাদ্য নিরাপত্তা না থাকে। তাই খিলাফত সরকার স্রষ্টা প্রদত্ত বিশাল উর্বর ভূমিকে কৃষি উৎপাদনে যথাযথভাবে ব্যবহার করার জন্য একটি সুষম নীতি প্রণয়ন করবে।

খিলাফতের উচিত হবে কৃষি ক্ষেত্রে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও কৌশল প্রয়োগ করা। এখানে উলেখ করার মতো একটি বিষয় হলো ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর উত্তর কোরিয়া 'যাচ্ ফিলসফি' নামে একটি সুষম কৃষিনীতি বাস্তবায়ন করে। কমিউনিস্ট চিন্তাধারার অনুসরণে এটি ছিল একটি তিন স্তরের কর্মসূচী। উত্তর কোরিয়া এখন তার কৃষি সরঞ্জাম ও প্রযুক্তি অন্যান্য দেশে রপ্তানি করতে আগ্রহী কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন শর্তের কারণে তা এই মূহুর্তে সম্ভব হচ্ছে না। আগামী দিনে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হলে উত্তর কোরিয়ার সাথে কৃষি উন্নয়ন চুক্তি করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে খিলাফত নিশ্চয়ই এমন বাণিজ্য সমঝোতায় পৌঁছবে যাতে করে আমরা তাদের কৃষি প্রযুক্তি ও কৌশল থেকে লাভবান হতে পারি।

২৭ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৩০ হিজরী
২৪ মে, ২০০৯ খ্রীষ্টাব্দ

কেন্দ্রীয় কার্যালয়:
এইচ. এম. সিদ্দিক ম্যানশন (৫ম তলা)
৫৫/এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।
যোগাযোগ: ৯৫৫৮৮৫৪, ০১৮১৯ ৫২২৬২৬, ০১৬৭০ ৭৪৪৭০১

হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশ